

# উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে

বাংলা উপন্যাসের নতুন ধরনের সন্ধান সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করো।

দেবেশ রায়ের ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ প্রবন্ধটি শুধু বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা নয়; এর মধ্যে নিহিত রয়েছে বাংলা উপন্যাসের জন্মের ইতিহাস, ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক প্রভাব, পাশ্চাত্য সাহিত্যিক মডেলের গ্রহণ, দেশজ কাহিনি-ঐতিহ্যের বিস্মরণ এবং নতুন উপন্যাসের সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা। প্রাবন্ধিকের মূল অনুসন্ধান—বাংলা উপন্যাস যে মডেল ও সাহিত্যিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, সেটিই কি তার একমাত্র সম্ভাব্য রূপ, নাকি বাংলা সমাজের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য থেকে আরও নতুন ধরনের উপন্যাসের জন্ম সম্ভব?

## ১. ঔপনিবেশিকতার মধ্যে বাংলা উপন্যাসের জন্ম

বাংলা উপন্যাসের আধুনিক রূপ গড়ে ওঠার পেছনে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় ভূমিকা ছিল। ইংরেজ শাসনের ফলে বাংলার শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য জ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। ইউরোপীয় উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন সাহিত্যরূপের প্রবর্তন ঘটে।

কিন্তু দেবেশ রায়ের আলোচনার তাৎপর্য এখানে যে, তিনি এই ঘটনাকে নিছক সাহিত্যিক উন্নতি হিসেবে দেখেন না। এর সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং আত্মপরিচয়ের সংকটও যুক্ত ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানব্যবস্থা শুধু নতুন সাহিত্যরূপ দেয়নি; আমাদের নিজেদের জ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে দেখার দৃষ্টিও অনেকাংশে পরিবর্তিত করেছিল।

প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে এমন একটি তীব্র অনুভূতি রয়েছে যে, আমরা যখন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে উপন্যাস শিখলাম, তখন নিজেদের পুরোনো কাহিনি বলার অনেক পদ্ধতিকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করলাম।

## ২. পাশ্চাত্য উপন্যাসের ‘মডেল’ এবং বাংলা উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসের নির্মাণে ইউরোপীয় উপন্যাসের প্রভাব অনস্বীকার্য। কাহিনির বিন্যাস, চরিত্র নির্মাণ, ঘটনা-পরম্পরা এবং গদ্যের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো পাশ্চাত্য উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন পাশ্চাত্য উপন্যাসের মডেলকে উপন্যাসের একমাত্র স্বাভাবিক বা সর্বজনীন মডেল বলে ধরে নেওয়া হয়।

প্রাবন্ধিক এই মডেল-নির্ভরতার দিকে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ একটি নির্দিষ্ট সমাজের ইতিহাস, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি থেকে তৈরি সাহিত্যিক রূপ অন্য সমাজে এসে একইভাবে কার্যকর হবে— এমন নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ, বাংলা উপন্যাসের বিকাশে পাশ্চাত্যের ভূমিকা স্বীকার করেও দেবেশ রায় তার সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করেছেন।

### ৩. ঔপনিবেশিক জ্ঞানব্যবস্থার প্রভাব

প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে লেখক দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিকতার প্রভাব কেবল সাহিত্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষা, প্রশাসন, বিজ্ঞান, সমাজচিন্তা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে ভারতীয় সমাজ নিজের ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে অনেক সময় পাশ্চাত্যের তৈরি ধারণার মধ্য দিয়ে বিচার করতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের একটি বড় তাৎপর্য হলো—জ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা জরুরি। অন্যের তৈরি মাপকাঠি দিয়ে নিজের সাহিত্যকে বিচার করলে নিজের অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে না।

### ৪. বাংলা সাহিত্যের দেশজ কাহিনি-ঐতিহ্য

বাংলা উপন্যাসের আগে বাংলায় কাহিনি বলার নিজস্ব দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। প্রবন্ধে বড়কথা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি রীতির উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রীতিগুলিতে কাহিনি শুধু লিখিত আখ্যান হিসেবে উপস্থিত ছিল না; তার সঙ্গে যুক্ত ছিল শ্রুতি, পরিবেশন, পুনরাবৃত্তি, গান, ছন্দ, কথকের উপস্থিতি এবং শ্রোতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

অর্থাৎ বাংলা সমাজে কাহিনি বলার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। আধুনিক উপন্যাসের আবির্ভাবের সঙ্গে সেই দেশজ কাহিনি-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, কিন্তু তার গুরুত্ব অনেকটাই আড়ালে চলে যায়। এই কারণেই নতুন উপন্যাসের সন্ধান করতে গেলে প্রাবন্ধিকের আলোচনায় দেশজ কাহিনি-রীতির পুনর্বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

### ৫. দেশজ কথনরীতি ও আধুনিক উপন্যাসের পার্থক্য

দেশজ কাহিনি-রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তার পরিবেশনমূলক চরিত্র। পাঁচালি বা কথকতার কাহিনি শুধু ‘কি ঘটল’ তা জানায় না; কীভাবে বলা হচ্ছে, কে বলছে, কারা শুনছে— এসবও তার অংশ।

আধুনিক ইউরোপীয় উপন্যাসে কাহিনি নির্মাণের যে লিখিত ও কাঠামোবদ্ধ রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সঙ্গে এই দেশজ কথনপদ্ধতির পার্থক্য ছিল।

সুতরাং, বাংলা উপন্যাসের নতুন ধরনের সন্ধান মানে কেবল পাশ্চাত্য মডেল পরিত্যাগ করা নয়; বরং বাংলার নিজস্ব কাহিনি বলার ঐতিহ্যের সম্ভাবনাকেও নতুনভাবে আবিষ্কার করা।

## ৬. আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার তাৎপর্য

দেবেশ রায় বাংলা উপন্যাসের প্রশ্নটিকে শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি আফ্রিকান ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক সমাজের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়েছেন। আফ্রিকান লেখকদের সামনে একটি বিশেষ সমস্যা ছিল— তাঁরা ঔপনিবেশিক ভাষা, বিশেষত ইংরেজি বা ইউরোপীয় ভাষায় লিখছেন, কিন্তু তাঁদের বিষয় তাঁদের নিজস্ব সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

এই দ্বন্দ্ব থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক প্রশ্ন উঠে আসে— ভাষা অন্যের হলেও কি সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা নিজের হতে পারে? প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, আফ্রিকান লেখকেরা ঔপনিবেশিক ভাষা ব্যবহার করেও নিজেদের সমাজ, ইতিহাস, লোকবিশ্বাস ও জীবনকে সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন। এই অভিজ্ঞতা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ।

## ৭. ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্ন

প্রবন্ধে ভাষার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে অনেক দেশে ঔপনিবেশিক ভাষা শিক্ষিত সমাজের প্রধান ভাষায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইতিহাস, সংস্কৃতি, স্মৃতি ও মানুষের জীবনবোধ।

তাই ঔপনিবেশিক ভাষায় লিখলেও লেখককে নিজের সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আফ্রিকান লেখকদের প্রসঙ্গ থেকে প্রাবন্ধিক এই সমস্যাটিকে দেখিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি একটু ভিন্ন— পাশ্চাত্য থেকে উপন্যাসের রূপ গ্রহণ করলেও তার বিষয়, ভাষা ও জীবনবোধ কি আমাদের নিজস্ব হতে পেরেছে?

## ৮. বিদেশি মডেলের পুনরাবৃত্তি নয়, নিজস্ব অভিজ্ঞতার রূপায়ণ

প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের একটি কেন্দ্রীয় দিক হলো—সাহিত্যে অনুকরণ নয়, আত্ম-অভিজ্ঞতার রূপায়ণ গুরুত্বপূর্ণ। কেবল পাশ্চাত্যের তৈরি উপন্যাসের কাঠামো অনুসরণ করে বাংলা সমাজের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ বাংলা সমাজের নিজস্ব ইতিহাস, শ্রেণিবিন্যাস, গ্রামীণ জীবন, প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা, লোকসংস্কৃতি ও বহুত্ব রয়েছে। এই বহুত্বকে উপন্যাসে প্রকাশ করতে গেলে উপন্যাসের ফর্মও প্রয়োজন অনুসারে দেশীয় হতে হবে।

## ৯. বাংলা সমাজের বৈচিত্র্য ও উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা

প্রবন্ধের পরবর্তী আলোচনায় লেখক বিশেষভাবে বাংলা সমাজের বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত প্রশ্ন হলো—যে উপন্যাসের মডেল একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও

সামাজিক বাস্তবতা থেকে এসেছে, তা কি বাংলা সমাজের সমস্ত স্তরকে সমানভাবে ধারণ করতে পারে?

বাংলার আদিবাসী জীবন, প্রান্তিক মানুষ, আঞ্চলিক জীবন ও বহুবিধ সামাজিক বাস্তবতা প্রচলিত মধ্যবিত্ত-কেন্দ্রিক উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে সবসময় যথাযথভাবে ধরা পড়ে না। তাই নতুন উপন্যাসের সন্ধান আসলে নতুন জীবনবোধ ও নতুন বাস্তবতাকে উপন্যাসের কেন্দ্রে নিয়ে আসার সন্ধানও।

## ১০. উপন্যাসের ফর্ম বা আঙ্গিক নিয়ে প্রশ্ন

প্রবন্ধের শেষাংশে এসে লেখক সরাসরি উপন্যাসের ফর্ম বা মডেল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এতদিন ধরে গল্প-উপন্যাস লেখার যে প্রচলিত ধরন তৈরি হয়েছে, সেটিই কি ভবিষ্যতের উপন্যাসের একমাত্র রূপ হবে— এই প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছেন। এখানে ‘নতুন ধরনের’ কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশিত হয়। নতুন উপন্যাসের জন্য প্রয়োজন হতে পারে—

- নতুন বিষয়,
- নতুন মানুষ,
- নতুন জীবন-অভিজ্ঞতা,
- নতুন ভাষা,
- নতুন বর্ণনাপদ্ধতি,
- নতুন কাহিনি-সংগঠন এবং
- নতুন আঙ্গিক।

অর্থাৎ নতুন বিষয়বস্তু পুরোনো কাঠামোর মধ্যে সবসময় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত নাও হতে পারে।

## ১১. ‘নতুন ধরনের’ বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার—দেবেশ রায় কোনো নির্দিষ্ট নতুন উপন্যাসের ‘ফর্মুলা’ দেননি। বরং তাঁর অনুসন্ধান হলো— উপন্যাসের রূপ কি স্থির, নাকি সমাজ ও মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্তন ঘটতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি বাংলা উপন্যাসের ঔপনিবেশিক উৎস, পাশ্চাত্য মডেল, দেশজ কাহিনি এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক সমাজের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করেছেন। অতএব, ‘নতুন ধরনের’ মানে শুধু নতুন আঙ্গিক নয়; নতুন বাস্তবতার উপযোগী নতুন সাহিত্যিক স্বাধীনতা।

## উপসংহার

দেবেশ রায়ের ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ প্রবন্ধে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসকে কেবল পাশ্চাত্য থেকে একটি সাহিত্যরূপ গ্রহণের ইতিহাস হিসেবে দেখা হয়নি। বরং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঔপনিবেশিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য, পাশ্চাত্য সাহিত্যিক মডেল, দেশজ কাহিনি-ঐতিহ্যের বিস্মরণ এবং নিজস্ব সাহিত্যিক পরিচয় অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

বাংলা উপন্যাস পাশ্চাত্যের কাছ থেকে একটি নতুন সাহিত্যরূপের শিক্ষা পেয়েছিল—এটি প্রাবন্ধিক অস্বীকার করেন না। কিন্তু সেই গ্রহণ যেন অনুকরণে পর্যবসিত না হয়, সেটিই তাঁর মূল উদ্বেগ। কারণ বাংলা সমাজের নিজস্ব জীবন, ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও বহুমাত্রিক মানুষের অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উপন্যাসের রূপও পরিবর্তিত হতে পারে।

সুতরাং, বাংলা উপন্যাসের ‘নতুন ধরনের খোঁজ’ আসলে শুধু নতুন আঙ্গিকের খোঁজ নয়; এটি নিজের জীবন-বাস্তবতা, সাংস্কৃতিক স্মৃতি, দেশজ কখনরীতি এবং সাহিত্যিক স্বাধীনতার নতুন করে আবিষ্কারের খোঁজ। প্রবন্ধের শেষাংশে উপন্যাসের প্রচলিত ফর্ম ও মডেল সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যেই এই অনুসন্ধানের চূড়ান্ত তাৎপর্য নিহিত।

## ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ প্রবন্ধটির নামকরণের তাৎপর্য

দেবেশ রায়ের ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ প্রবন্ধের নামটি বিষয়বস্তুর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। নামটির মধ্যে একদিকে যেমন বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত রূপ ও তার উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান রয়েছে, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে ভবিষ্যতের উপন্যাসের সম্ভাব্য রূপ নিয়ে প্রশ্ন। প্রবন্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখক মূলত অনুসন্ধান করেছেন—উপন্যাস কি একটি নির্দিষ্ট ও স্থির ছাঁচে আবদ্ধ, নাকি সমাজ, মানুষ ও বাস্তবতার পরিবর্তনের সঙ্গে তার রূপও পরিবর্তিত হতে পারে?

### ১. ‘উপন্যাস’— আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়

শিরোনামের প্রথম শব্দ ‘উপন্যাস’। প্রবন্ধে লেখক উপন্যাসকে কেবল একটি সাহিত্যরূপ হিসেবে দেখেননি; এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন সমাজ, ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি এবং মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতাকে।

উপন্যাস কীভাবে তৈরি হয়, তার বিষয়বস্তু কোথা থেকে আসে, কোন ধরনের বাস্তবতা উপন্যাসের উপাদান হয়ে ওঠে এবং উপন্যাসের আঙ্গিক কীভাবে গড়ে ওঠে—এসব প্রশ্ন প্রবন্ধের কেন্দ্রে রয়েছে।

## ২. ‘নতুন ধরনের’ কথাটির তাৎপর্য

শিরোনামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ‘নতুন ধরনের’। প্রাবন্ধিক প্রচলিত উপন্যাসের রীতিকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিবর্তিত জীবন-অভিজ্ঞতাকে কি পুরোনো উপন্যাসের কাঠামোয় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব?

প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি উপন্যাসের ‘ফর্ম’ বা ‘মডেল’ সম্পর্কে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে গল্প-উপন্যাস লেখার যে পদ্ধতি চলে আসছে, তা ভবিষ্যতের উপন্যাসের একমাত্র পদ্ধতি হবে কি না—এই প্রশ্নই ‘নতুন ধরনের’ কথাটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

অতএব, ‘নতুন ধরনের’ বলতে শুধু নতুন বিষয় নয়; নতুন জীবনকে প্রকাশ করার জন্য নতুন আঙ্গিক ও নতুন কথনপদ্ধতির সম্ভাবনা বোঝানো হয়েছে।

## ৩. ‘খোঁজে’ শব্দটির তাৎপর্য

শিরোনামের ‘খোঁজে’ শব্দটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লেখক কোনো একটি নির্দিষ্ট নতুন উপন্যাসের মডেল ঘোষণা করেননি। তিনি বরং অনুসন্ধান করেছেন—নতুন ধরনের উপন্যাসের সম্ভাবনা কোথায়?

এই ‘খোঁজ’ কখনও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের দিকে, কখনও ঔপনিবেশিকতার দিকে, কখনও পাশ্চাত্য সাহিত্যিক মডেলের দিকে এবং কখনও দেশজ কাহিনি-ঐতিহ্যের দিকে ফিরে যায়। অর্থাৎ, ‘খোঁজ’ একটি চলমান অনুসন্ধানের নাম; এটি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়।

## ৪. ঔপনিবেশিকতার মধ্যে গড়ে ওঠা উপন্যাসের পুনর্বিবেচনা

বাংলা উপন্যাসের আধুনিক রূপ পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও ইউরোপীয় সাহিত্যরীতির সংস্পর্শে বিকশিত হয়েছিল। প্রাবন্ধিক সেই ইতিহাসকে পুনর্বিবেচনা করেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে আমরা উপন্যাসের একটি কাঠামো গ্রহণ করলেও আমাদের নিজেদের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন-অভিজ্ঞতা তার মধ্যে কতটা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে—এই প্রশ্নটি থেকে যায়। এই প্রশ্ন থেকেই ‘নতুন ধরনের’ উপন্যাসের সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়।

## ৫. দেশজ কাহিনি-ঐতিহ্যের দিকে ফিরে দেখা

প্রবন্ধে বড়কথা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্তন ইত্যাদি দেশজ কাহিনি বলার রীতির প্রসঙ্গ এসেছে। এগুলির মধ্যে বাঙালির নিজস্ব কাহিনি নির্মাণ ও পরিবেশনের ঐতিহ্য নিহিত ছিল।

ফলে ‘নতুন ধরনের’ উপন্যাসের সন্ধান কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে আরও নতুন কিছু গ্রহণের চেষ্টা নয়; বরং নিজেদের বিস্মৃত বা অবহেলিত কখনঐতিহ্যের মধ্যেও নতুন সম্ভাবনা খুঁজে নেওয়া।

## ৬. অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের অভিজ্ঞতা

প্রাবন্ধিক আফ্রিকা ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক সমাজের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গও এনেছেন। সেখানে লেখকেরা ঔপনিবেশিক ভাষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যিক কাঠামোর সঙ্গে নিজেদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবন-অভিজ্ঞতার সম্পর্ক তৈরি করেছেন। এই আলোচনা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে—বাইরের সাহিত্যিক রূপ গ্রহণ করেও কীভাবে নিজের সমাজ ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায়?

## ৭. উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান

প্রবন্ধের শেষাংশে এসে ‘খোঁজে’ শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়। লেখক কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরিবর্তে ভবিষ্যতের উপন্যাসের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে চান। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ হলো— আজকের বা আগামী দিনের জীবন যে নতুন অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা তৈরি করছে, উপন্যাসকেও সেই অনুযায়ী নিজের রূপ পরিবর্তনের স্বাধীনতা রাখতে হবে।

## ৮. নামকরণ ও প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য

প্রবন্ধটির সমগ্র আলোচনাকে যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে নামের তিনটি শব্দকে তিনটি স্তর হিসেবে দেখা যায়—

| শব্দ       | তাৎপর্য                          |
|------------|----------------------------------|
| উপন্যাস    | আলোচনার প্রধান বিষয়             |
| নতুন ধরনের | অনুসন্ধানের লক্ষ্য               |
| খোঁজে      | সেই অনুসন্ধানের চলমান প্রক্রিয়া |

এই তিনটির সমন্বয়েই প্রবন্ধের নামটি পূর্ণতা পেয়েছে।

উপসংহার

সুতরাং, ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ নামকরণটি অত্যন্ত সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাবন্ধিক বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত রূপকে অস্বীকার করেননি; বরং তার ঔপনিবেশিক উৎস, পাশ্চাত্য প্রভাব, দেশজ কাহিনি-ঐতিহ্য এবং পরিবর্তিত জীবন-বাস্তবতার আলোকে নতুনভাবে বিচার করেছেন।

তাই এখানে ‘নতুন ধরনের’ মানে কেবল নতুন আঙ্গিক নয় এবং ‘খোঁজ’ মানে কোনো নির্দিষ্ট ফর্মের ঘোষণা নয়। বরং এটি নতুন বাস্তবতার উপযোগী নতুন উপন্যাসের সম্ভাবনা অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া। এই কারণেই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের সঙ্গে ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ নামটি সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

দেবেশ রায় ‘দুঃসময়কে’ কেন উপন্যাস রচনার ‘সুসময়’ বলেছেন?

উত্তর

ভূমিকা

দেবেশ রায়ের ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ প্রবন্ধের শুরুতেই উপন্যাসের বিষয় ও সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। তিনি জানতে চান, কেন ঔপন্যাসিক দুঃসময়কে বেছে নেন এবং কেন সময়কে ‘গোলমাল’ করে দেন। কারণ সময় যদি সম্পূর্ণ শান্ত, স্বাভাবিক ও সংঘাতহীন হয়, তাহলে চরিত্র ও ঘটনাকেন্দ্রের বিকাশ অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হয়। বিপরীতে সংকটময় সময় মানুষের অন্তর্গত বাসনা, দ্বন্দ্ব, ভয়, স্বার্থ, সম্পর্ক এবং সামাজিক বৈপরীত্যকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। এই অর্থেই দুঃসময় ঔপন্যাসিকের কাছে ‘সুসময়’।

## ১. দুঃসময় কেন উপন্যাসের উপযোগী?

দুঃসময় মানুষের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করে, গোপন বাসনাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে, সামাজিক বৈষম্যকে প্রকট করে, ক্ষমতা ও শোষণের সম্পর্ককে দৃশ্যমান করে, ব্যক্তি ও সমাজের সংঘাতকে তীব্র করে এবং প্রচলিত মূল্যবোধকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। তাই দুঃসময় উপন্যাসের জন্য শুধু বিষয় নয়, একটি বিশেষ সৃষ্টিশীল পরিস্থিতি।

## ২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও এর সাহিত্যিক প্রতিফলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপীয় সভ্যতার আত্মবিশ্বাসকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এরিক মারিয়া রেমার্কের All Quiet on the Western Front-এ যুদ্ধ কীভাবে তরুণ মানুষের জীবন, মানসিকতা ও মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে, তা কেন্দ্রে এসেছে। যুদ্ধের ‘দুঃসময়’ এখানে মানুষের অন্তর্জীবন ও সভ্যতার সংকট বোঝার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

### ৩. মহামন্দা ও The Grapes of Wrath

১৯২৯-এর পরের Great Depression আমেরিকায় বেকারত্ব, দারিদ্র্য, কৃষকের উচ্ছেদ ও শ্রমজীবী মানুষের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। জন স্টাইনবেকের The Grapes of Wrath এই সংকটের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ভূমিহীনতা, দারিদ্র্য ও শ্রমিকজীবনের বাস্তবতা প্রকাশ করেছে।

### ৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হলোকস্ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হলোকস্ট মানুষের সভ্যতা, নৈতিকতা ও মানবতার ধারণাকে কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। প্রিমো লেভির If This Is a Man-এর মতো রচনায় যুদ্ধ মানুষের অস্তিত্ব, স্মৃতি, নৈতিকতা ও পরিচয়ের সংকট হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।

### ৫. ১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষ

১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষ বাংলা সাহিত্যে গভীর ছাপ ফেলেছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশনি সংকেত-এ গ্রামীণ বাংলার স্বাভাবিক জীবন কীভাবে দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে বদলে যায়, তা দেখা যায়। ভবানী ভট্টাচার্যের So Many Hungers!-এ দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ, ঔপনিবেশিক প্রশাসন, শ্রেণি ও সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত বৃহত্তর সংকট হিসেবে এসেছে।

### ৬. ভারতীয় দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-জীবন

১৯৪৭-এর দেশভাগ মানুষকে ভিটেমাটি হারানো, উদ্বাস্তু হওয়া, পরিচয় ও অস্তিত্বের নতুন সংকটের মুখে দাঁড় করায়। খুশবন্ত সিংহের Train to Pakistan দেশভাগের সহিংসতা ও মানুষের সম্পর্কের সংকটকে কেন্দ্র করে রচিত। রাজনৈতিক ইতিহাস এখানে সাধারণ মানুষের জীবন ও নৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

### ৭. লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক সংকট ও 'Dictator Novel'

লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক অস্থিরতা ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অভিজ্ঞতা 'dictator novel'-এর মতো সাহিত্যিক প্রবণতার জন্ম দেয়। এসব রচনায় ক্ষমতা, রাষ্ট্র, স্মৃতি ও জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্ন উঠে আসে। অর্থাৎ দুঃসময় ইতিহাস ও জাতীয় পরিচয়কে নতুনভাবে বোঝার সাহিত্যিক ক্ষেত্র তৈরি করে।

### ৮. সংকট মানুষের 'অন্ধকার বাসনা' প্রকাশ করে

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সামাজিক নিয়ম ও নৈতিকতার আবরণে মানুষের অনেক প্রবৃত্তি চাপা থাকে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দেশভাগ বা রাজনৈতিক সংকটে সেই আবরণ সরে যায়। মানুষের স্বার্থপরতা ও মানবিকতা—দুই বিপরীত প্রবণতাই প্রকাশ পেতে পারে। এই দ্বন্দ্ব উপন্যাসের চরিত্রকে গভীর ও জটিল করে।

## ৯. দুঃসময় সামাজিক মুখোশ খুলে দেয়

সংকট এলে সমাজের বৈষম্য প্রকট হয়—কে খাদ্য পায়, কে বঞ্চিত হয়; কে নিরাপদ, কে বিপন্ন; কে সম্পদ হারায়, কে লাভবান হয়। এই প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়ে সমাজের ক্ষমতার কাঠামো প্রকাশিত হয়। তাই সংকটের সময় ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত চেহারা উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে।

## ১০. দুঃসময় নতুন ধরনের উপন্যাসের জন্ম দিতে পারে

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণহত্যা, দেশভাগ বা রাজনৈতিক নিপীড়নের মতো বৃহৎ অভিজ্ঞতা অনেক সময় প্রচলিত আঙ্গিকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধরা যায় না। ফলে নতুন বর্ণনাপদ্ধতি, চরিত্র নির্মাণ ও সময়-ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ দুঃসময় নতুন অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কাহিনি এবং নতুন আঙ্গিকের সম্ভাবনা তৈরি করে।

## ১১. দুঃসময় ‘সত্য’ আবিষ্কারের সময়

দুঃসময়ের সময় মানুষের ও সমাজের এমন কিছু সত্য প্রকাশিত হয়, যা স্বাভাবিক সময়ে দৃশ্যমান নয়। সেই সত্য সুখকর নাও হতে পারে; কিন্তু উপন্যাসিকের কাজ তার মুখোমুখি হওয়া। তাই দুঃসময় জীবনের গভীরতর সত্য আবিষ্কারের জন্য উপন্যাসিকের কাছে ‘সুসময়’।

## ১২. বিশ্বসাহিত্যের উদাহরণগুলি এক নজরে

| সংকটময় পরিস্থিতি           | সাহিত্যিক রচনা                           | প্রকাশিত বাস্তবতা                                |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| প্রথম বিশ্বযুদ্ধ            | রেমার্ক — All Quiet on the Western Front | যুদ্ধ, মৃত্যু, তরুণ প্রজন্মের মানসিক বিপর্যয়    |
| Great Depression            | স্টাইনবেক — The Grapes of Wrath          | দারিদ্র্য, কৃষক-উচ্ছেদ, শ্রমিকজীবন               |
| দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ/হলোকস্ট | প্রিমো লেভি — If This Is a Man           | অস্তিত্ব, স্মৃতি, মানবতা ও নৈতিক সংকট            |
| ১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষ    | বিভূতিভূষণ — অশনি সংকেত                  | ক্ষুধা, গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন                  |
| ১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষ    | ভবানী ভট্টাচার্য — So Many Hungers!      | যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, শ্রেণি ও ঔপনিবেশিক শাসন        |
| ১৯৪৭-এর দেশভাগ              | খুশবন্ত সিংহ — Train to Pakistan         | দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা, উদ্বাস্তু ও মানবসম্পর্ক |

|                        |          |                          |                                            |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|
| লাতিন<br>রাজনৈতিক সংকট | আমেরিকার | বিভিন্ন ‘dictator novel’ | ক্ষমতা, রাষ্ট্র, ইতিহাস ও<br>জাতীয় পরিচয় |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|

### উপসংহার

দেবেশ রায় যখন দুঃসময়কে উপন্যাস রচনার ‘সুসময়’ বলেন, তখন তিনি দুঃখ বা বিপর্যয়কে মহিমান্বিত করছেন না। তাঁর বক্তব্যের মূল তাৎপর্য হল—সংকটের সময় জীবন তার স্বাভাবিক আবরণ হারায় এবং তার অন্তর্নিহিত সত্যগুলি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস, মহামন্দার দারিদ্র্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হলোকস্ট, ১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষ, ভারতীয় দেশভাগ কিংবা লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক সংকট—প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিহাসের দুঃসময় সাহিত্যকে নতুন বিষয়, নতুন চরিত্র এবং কখনও নতুন আঙ্গিক দিয়েছে। অতএব, দুঃসময় মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে, কিন্তু সেই বিপর্যয়ের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত চরিত্র, সামাজিক বৈষম্য, অন্ধকার বাসনা, মানবিকতা ও ইতিহাসের গভীর সত্য প্রকাশিত হয়। সেই সত্যকে কাহিনিতে রূপ দেওয়ার সুযোগই দুঃসময়কে উপন্যাসিকের কাছে ‘সুসময়’ করে তোলে।